Project-টি তৈরী করতে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সাহায্য ও নিরন্তর উৎসাহ দানের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদের বিভাগীয় প্রধান মাননীয় শ্রী বিজনসরকার মহাশয়ের নিরন্তর সাহায্য ও অনুপ্রেরনা আমাকে সার্বিক দিক দিয়ে সাহায্য করেছে। তাছাড়াও বিভাগীয় অধ্যাপক মাননীয় শ্রী সিদ্ধার্থচন্দ্র মুখার্জী, মাননীয় শ্রী রাজকুমার মন্ডল ও মাননীয় শ্রী রাজেন রায় মহাশয়- প্রত্যেকের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এনারা সকলেই উৎসাহের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও সঠিক পথনির্দেশনা করেছেন Project তৈরী করতে। কলেজের অধ্যক্ষা মাননীয়া শ্রী অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয়ের সার্বিক সহযোগিতাও ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। কলেজের অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপকগন ও সমস্ত শিক্ষাকর্মীগন যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন এই কাজে। তবে যে কথা উল্লেখ না করলে আমার সেই কৃতজ্ঞতাস্বীকার অসম্পূর্ন থাকবে তাহলো কলেজ গ্রন্থাগারের কথা। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মহাশয় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও তথ্যাবলী সরবরাহ করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে উক্ত Project-তৈরী করতে কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি থেকে থাকে, তাহলে তার দায় ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ন আমার।

প্রকল্পের নাম — আকবরের ধর্মনীতি

প্রকল্পের মূল আলোচ্যসূচী:

১. প্রাথমিক পর্ব (১৫৫৬-১৫৭৬খ্রী:)
২. দ্বিতীয় পর্ব (১৫৭৬-১৫৮০খ্রী:)
৩. ইবাদৎ খানা গঠন
৪. মাহজার ঘোষনাপত্র
৫. বিদ্রোহীদের সাথে সংঘাত
৬. তৃতীয় পর্ব (১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়কাল)
৭. উলেমার প্রতি মনোভাব
৮. দীন-ই-ইলাহী

২.৩ ধর্মনীতি

মধ্যযুগের ভারতে আকবর তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও তার প্রয়োগ নিয়ে এক অনন্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ কোনোভাবেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেনি। তুর্কি-মোঙ্গল ঐতিহ্যের দ্বারা তিনি যেমন লালিত হয়েছিলেন তেমনি সুফিদের উদারতা এবং ভারতে সুলতানী রাজত্বে ভক্তিবাদীদের মনোভাবের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। ভারতে বাবর এবং হুমায়ুনের কার্যাবলীর মধ্যেও ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায়নি, তেমনি চেঙ্গিস খান এবং তৈমুরের আচরণেও দেখা যেত না। শের শাহের কাছে পরাস্ত হওয়ার পর হুমায়ুন পারস্যে *শাহ* তহমাস্পের দরবারে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে পারস্যের শিয়াদের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতে ফেরার সময়ে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বহু শিয়া অভিজাত ছিল যারা পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে এদেশে বাস করতে থাকে। এমনই পরিবেশের মধ্যে আব্দুল লতিফের মতো এক বিদগ্ধ পণ্ডিতকে আকবরের শিক্ষক রূপে হুমায়ুন নিয়োগ করেন। পারস্যে অবশ্য লতিফকে সুন্নি হিসাবে এবং ভারতে শিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

প্রাথমিক পর্ব (১৫৫৬-৭৩ খ্রি.)

আব্দুল লতিফের কাছে যেমন আকবর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তেমনি বৈরাম খানের মতো শিয়া তাঁর রাজনৈতিক অভিভাবক ছিলেন। এমনই পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠতে গিয়ে তিনি শুরু থেকেই রাজকার্যে উদারতা প্রদর্শন করতে থাকেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকেই তিনি পরাজিত পক্ষের তথা বিদ্রোহী গ্রামের অধিবাসীদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রথা অনুযায়ী দাসে পরিণত করা থেকে বিরত থাকেন। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিন্দুদের তীর্থস্থানগুলিতে তীর্থকর প্রত্যাহার করেন। এই সিদ্ধান্তে প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা রাজকোষের ঘাটতি হয়। *উলেমা* সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর হিন্দুদের ওপর ধার্য *জিজিয়া* পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। এই বাবদে প্রাপ্ত অর্থের সিংহভাগই *উলেমা* ভোগ করত। ফলত আকবরকে কঠিন প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে হয়। আবুল ফজল এই সময়কার ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছেন

যে, *উলেমা* সম্রাটের মনোভাব সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। সম্রাট চেয়েছিলেন ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করতে। সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই বীরবলের মতো হিন্দুকে তিনি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেন এবং উচ্চপদ প্রদান করেন। অবশ্য *জিজিয়া* প্রত্যাহারের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। ড. ইক্তিদার আলম খান লিখেছেন যে, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দেও *জিজিয়ার* উল্লেখ আছে। সম্ভবত বদায়ুনী এক্ষেত্রে সঠিক তারিখটি দিয়েছেন যা ছিল ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ। মনে হয় আকবরের গরিমা বৃদ্ধির তাগিদে আবুল ফজল ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য পেশ করেছেন।

প্রাথমিক পর্বে আকবর একজন নিয়মনিষ্ঠ মুসলমানের মতোই আচরণ করতেন। তিনি নিয়মিত *নামাজ, রোজা* ইত্যাদি পালন করতেন। সরকারি আনুকূল্যে *হজযাত্রার* ব্যবস্থা করতেন এবং কোনও সময়ে মক্কায় দাতব্যের জন্য সরকারি অর্থ সেদেশে পাঠানোর ব্যবস্থাও করেন। এই সময়ে আকবরের বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন শেখ আব্দুন নবী এবং আব্দুল্লা সুলতানপুরী নামে দুই *উলেমা*। সুলতানপুরী ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া মতবাদে বিশ্বাসী এবং শের শাহের রাজত্বকালে তিনি বিধর্মীদের গণহত্যার জন্য দায়ী ছিলেন। বৈরাম খানের জীবদ্দশায় তাঁর প্রভাব বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হলেও তিনি পরবর্তীকালে তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অগাধ নিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ আকবরের কাছ থেকে তিনি *মখদুম-উল-মুলক* উপাধি লাভ করেন। তাঁরই মতো প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন আব্দুন নবী। আকবর আব্দুন নবীর মুখ থেকে *হাদীসের* বাণী শুনতেন এবং তাঁর জুতো পর্যন্ত বহন করেছিলেন। অর্থাৎ যে সময়ে আকবর রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শন করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেই সময়েই দরবারে *উলেমা*-র প্রভাব ছিল যথেষ্ট গভীর। আব্দুন নবীর ইচ্ছা অনুসারে ধর্মীয় ব্যক্তিদের *ইনাম* বাবদ নিষ্কর (*সয়ুরঘল*) জমি বণ্টিত হত। বলাইবাহুল্য যে নিজের অনুচরদেরই এই ধরনের জমি আব্দুন নবী দিতেন। এ সম্পর্কে বদায়ুনী লিখেছেন যে, বণ্টনের কোনও মাপ ছিল না এবং আব্দুন নবী যথেচ্ছভাবে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। একই সঙ্গে শিয়াদের তিনি হত্যার নির্দেশও দিতেন। এমনকি, দিল্লিতে আমীর খসরুর কবরের কাছে বিখ্যাত শিয়াসাধক মুর্তজা শিয়াজীর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে অন্যত্র কবরস্থ করা হয় তাঁরই নির্দেশে। আব্দুন নবীর এক্ষেত্রে যুক্তি ছিল যে আমীর খসরুর মতো এক সুন্নিসাধক কোনোভাবেই এক বিধর্মীর সান্নিধ্যে শান্তি পাচ্ছেন না।

দ্বিতীয় পর্ব (১৫৭৩-৮০ খ্রি.)

গুজরাট অভিযানকালে আকবর ক্যাম্বে উপসাগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং সর্বপ্রথম খ্রিস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। পোর্তুগিজ বণিকদের সঙ্গে পাদ্রীরাও তাদের কুঠিতে বাস করত। ওই পাদ্রীদের তিনি নিজের রাজধানীতে আমন্ত্রণ করেন। ইতিপূর্বে মালব, রাজপুতানা এবং পূর্ব ভারত জয় করার মধ্য দিয়ে তিনি উত্তর ভারতে এক রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সময়ে তাঁর মনে এমন ধারণা জন্ম নেয় যে এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা যে তিনি ভারতের ঐক্যসাধন

করুন। বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পথে তিনি তাঁর বিরোধী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করতে সমর্থ হন এবং এক অপার শান্তির জগতে এসে উপনীত হন। বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতে গিয়ে সমস্ত প্রজার সুখ কামনা করাও যে তাঁর কর্তব্য—এ বিষয়ে আকবর ধীরে ধীরে সচেতন হতে থাকেন। সম্ভবত, এ মনোভাবের পেছনে সুফিদের বিরাট প্রভাব ছিল। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আকবর প্রতিবছর একবার তো বটেই, কোনও বছর একাধিকবার আজমিড়ে বিখ্যাত সুফি সন্ত শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তির দরগায় প্রার্থনা জানাতে যেতেন। নিজের ধর্মগুরু হিসাবে শেখ সেলিম চিস্তিকে তিনি বরণও করেছিলেন।

ইবাদাৎখানা গঠন

সুফিদের প্রভাবের ফলে আকবরের ধর্ম সম্পর্কে মনোভাব যথেষ্ট উদার ছিল। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি শেখ সেলিমের উপাসনাস্থল ফতেপুর সিক্রিকে নিজের রাজধানী হিসাবে গড়ে তুলতে থাকেন। এখানেই বিখ্যাত গুজরাটি সুফি শেখ আবদুল্লা নিয়াজীর উপাসনাস্থলকে কেন্দ্র করে আকবর ধর্মালোচনার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করান। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তার নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং একেই বলা হল *ইবাদাৎখানা*, যার সঠিক অবস্থিতি নিয়ে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

এই ইবাদাৎখানাতে আকবর প্রথমে সুন্নি মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সঙ্গে এবং তারপর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন। অবশ্য আকবর শাসক হিসাবে অভিনব কিছু করেননি। উমাইদ ও আব্বাসীয় শাসকরা এই ধরনের আলোচনা নিয়মিত করতেন। হিরাটের সুলতান হুসেন বাইকরাও এই প্রথা চালু করেছিলেন। তবে আকবরকে সব থেকে বেশি বিস্মিত করেছিলেন বাংলার সুলতান সুলেইমান কররানি। তিনি প্রতি রাতেই বিখ্যাত সব পণ্ডিতের সান্নিধ্যে ঘোরতর ধর্মীয় আলোচনায় মগ্ন থাকতেন এবং তা রাত গড়িয়ে ভোর পর্যন্ত চলত।

ইবাদাৎখানা-য় প্রতি বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর আকবর প্রথমে মুসলমান ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনায় বসতেন। ইসলামী দিনপঞ্জী অনুসারে বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত অর্থে পবিত্র শুক্রবারের (*জুম্মা*) শুরু। আলোচনার সময় প্রসারিত হতে থাকায় বহু রাতে আলোচনাস্থল সম্রাটের শয়নকক্ষে স্থানান্তরিত হত। প্রাথমিক অবস্থায় *উলেমা*, সুফি সাধক, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সম্রাটের অনুগত কিছু অভিজাত এই আলোচনাসভায় উপস্থিত থাকত। এরা চারভাগে বিভক্ত ছিল এবং সভাকক্ষে সেইমতো আসন গ্রহণ করত। আকবর ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে মতবিনিময় করতেন। তখন বিতর্কের বিষয় ছিল নানাবিধ, যাদের অন্যতম ছিল আকবরের বিবাহ। সম্রাট কূটনৈতিক প্রয়োজনে রাজপুতানায় তখন বিবাহের রাজনীতি শুরু করেছিলেন। কিন্তু একজন মুসলমান পুরুষ কয়টি বিবাহ করতে পারে—এ নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ ছিল। সুন্নি মুসলমানদের চার মতের (হানাফী, সাফাই, মালিকী, হনবলী) মধ্যে হানাফীরা মনে করত চারটির বেশি বিবাহ শাস্ত্রবিরোধী। অপরদিকে মালিকীরা এ বিষয়ে ছিল কিছুটা উদার।

আকবর কিন্তু যথাযথ উত্তর লাভ করতে ব্যর্থ হন। *উলেমা*-র কাছ থেকে তিনি ধর্ম সম্পর্কে এবং ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে দিশা চেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে একজন *আলিম* অন্যের ওপর তার নিজের বিদ্যার গরিমা জাহির করতেই অধিক ব্যস্ত। এসব ঘটনায় আকবর বিরক্ত বোধ করেন।

১৫৭৮ *খ্রিস্টাব্দে*-আকবর *ইবাদাৎখানার* দরজা হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান এবং জরথুস্ট্রবাদীদের জন্য উন্মুক্ত করেন। এর ফল হল আরও মারাত্মক। মুসলমান পণ্ডিতদের মধ্যে যে কয়টি বিষয়ে ন্যূনতম ঐক্যমত ছিল সেগুলিও প্রশ্নের মুখে পড়ল। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ধারায় পণ্ডিতদের তর্ক ও আলোচনা দৈহিক কসরতে গিয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আকবর *ইবাদাৎখানা* স্থাপন করেছিলেন তা আদৌ সফল করা গেল না। বিরক্ত আকবর ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে এসব বন্ধ করে দেন।

যথাযথভাবে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য *ইবাদাৎখানা* স্থাপন করা হয়েছিল—এ নিয়ে বর্তমানকালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কারণ, আকবর যদি সত্যই নিজের ধর্ম তথা অন্যান্য ধর্মের আদর্শ অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঈশ্বরের দৃঢ় অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করতে চাইতেন তাহলে তিনি যেকোনও প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগতভাবে তা করতে পারতেন। এ জন্য নিয়মিত সভা ডেকে তা করার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তিনি অবস্থাবিশেষে তা করেও ছিলেন। যেমন, জৈন পণ্ডিত পুরুষোত্তম এবং দেবীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তেমনিভাবে অসুস্থ শেখ তাজুদ্দীন এবং ইয়াজদের মোল্লা মুহম্মদকে শায়িত অবস্থায় সম্রাটের কাছে আনা হয় ধর্মালোচনা করার উদ্দেশ্যে। *ইবাদাৎখানা*-য় এঁরা প্রবেশ করেননি। তাই ড. সতীশচন্দ্র মনে করেন যে, *ইবাদাৎখানা* থেকে আকবর নিশ্চিতভাবে কী চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে তিনি নিজেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। তাই পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য এবং তাঁদের ব্যক্তিগত আত্মাভিমান দেখে আকবর ব্যথিত হয়ে মন্তব্য করেন যে, তিনি ওইসব বিতর্কের কিছুই শোনেননি।

ড. ইক্তিদার আলম খান আকবরের রাজত্বের প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন। ওই সময়কালে ভারতে আকবর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে তাঁর অভিজাতগোষ্ঠী তৈরি করেন। সিংহাসনে বসার সময়ে অভিজাত হিসাবে তিনি ইরানী ও তুরানীদেরই পেয়েছিলেন। বৈরাম খানের অপসারণ ও মৃত্যুর পর রাজপুত এবং ভারতীয় মুসলমানরাও মুঘল অভিজাতগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল। ইরানীদের সংখ্যা ও কর্তৃত্ব অটুট থাকলেও তুরানীদের আধিপত্য বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলত চঘতাই ঐতিহ্য ইত্যাদির অবসান ঘটে এবং আকবর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। তুরানী আধিপত্য খর্ব হওয়ার পর থেকে নানা সময়ে তুরানীরা বিদ্রোহে প্ররোচনা দান তথা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহে যোগদান করে। বিদ্রোহ দমন থেকে শুরু করে সাম্রাজ্য গঠনে ইরানী অভিজাতরা আকবরের পক্ষে ছিল। তবে উজবেক বিদ্রোহের পর আকবর রাজপুতদের প্রতিপত্তি খর্ব করে কিয়দংশে ধর্মীয় মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে চিতোর বিজয়কে তিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ইসলামের জয় বলেন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ পাঞ্জাবে সরকারি আমলাদের প্রতি যে

নির্দেশনামা জারি করেন, তা ছিল পুরোপুরি ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত। এমনকি, বিলগ্রাম পরগনার *মুহতসিব*-কে তিনি ওই পরগনায় হিন্দুদের কোনোরকম বিগ্রহ অর্চনা নিষিদ্ধ করতে নির্দেশ পাঠান। অবশেষে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি *জিজিয়া* ফিরিয়ে আনেন। অর্থাৎ ধর্মীয় উদারতা তখনও প্রকাশিত হয়নি।

কিন্তু *ইবাদাৎখানা* থেকে আকবর কিছুই লাভ করেননি এমন সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। আকবর আলোচনাসভাগুলি থেকে দুটি বিষয় নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করেন— (১) প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব সার সত্য আছে এবং (২) প্রতিটি ধর্ম একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। সম্ভবত এইসব শিক্ষাই আকবরকে সাম্রাজ্যে সকল ধর্মের সহাবস্থানের অর্থাৎ *সুল-ই-কুল*-এর নীতি রূপায়ণে উদ্বুদ্ধ করে। আবার দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বেষ প্রকাশিত হয়ে পড়ায় এবং অন্য মত গ্রহণে *উলেমার* তীব্র আপত্তি থাকায় আকবর তাদের থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এবং সেই সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সাম্রাজ্য শাসনে সত্বর প্রতিফলিত হয়।

মহজর ঘোষণাপত্র

ইবাদাৎখানা-য় আলোচনা চলাকালে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে *মহজর* ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বদায়ুনী এই অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং তার প্রামাণ্য বিবরণও দিয়েছেন। এই ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ছিলেন আবুল ফজলের পিতা এবং তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শেখ মুবারক। তিনি, শেখ আব্দুন নবী এবং আব্দুল্লা সুলতানপুরী সহ মোট সাতজন বিখ্যাত *আলিম* এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। ভিনসেন্ট স্মিথের ধারণা যে, ক্যাথলিক ধর্মে পোপের যে ক্ষমতা, আকবর নিজের সাম্রাজ্যে সেই জাতীয় ক্ষমতা অর্জনের পথে এই *মহজর* ঘোষণাপত্র *উলেমাকে* দিয়ে স্বাক্ষর করান। আবার অন্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে এমন মতও প্রচলিত যে, তখন ইসলামী দুনিয়ায় দুজনের প্রভাব ছিল সর্বাধিক—সুন্নিদের ওপর অটোম্যান *খলিফার* এবং শিয়াদের ওপর পারস্যের সম্রাটের। আকবর এঁদের দুজনের প্রভাব থেকেই নিজেকে মুক্ত করার জন্য *মহজর* জারি করান। আধুনিককালের কিছু ঐতিহাসিক এই ঘোষণাপত্রকে নিছকই জালিয়াতি বলে মনে করেন। আকবরের মতো কার্যত অশিক্ষিত এক ব্যক্তি ধর্মের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিয়েছিলেন—যা কোনোভাবেই ঠিক ছিল না।

মহজর ঘোষণাপত্রে সম্রাটকে একইসঙ্গে ইসলামের প্রধান ব্যক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতিরূপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। ইসলামে *খলিফা*-কেই এই বিশেষণে ভূষিত করা হত। আবার এমনও বলা হল যে, ইসলামের বিভিন্ন ধারার মত ও তাদের প্রয়োগ নিয়ে *মুজতাহিদ*-দের (অর্থাৎ পবিত্র বিধির ব্যাখ্যাকর্তা) মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মানবজাতির কল্যাণে এবং পৃথিবী শাসনের উদ্দেশ্যে সম্রাট যে-কোনও একটি মত গ্রহণ করতে পারবেন। একই সঙ্গে মানবকল্যাণে আকবর নিজে যে-কোনও বিধি জারি করতেও পারবেন। অবশ্য সেই বিধি কোরান এবং হাদিসের ব্যাখ্যার পরিপন্থী হতে পারবে না। আকবর যে বিধি জারি করবেন তা হবে সকলের অবশ্য মান্য। তাদের বিরোধিতার অর্থ ঈশ্বরের বিরাগভাজন হওয়া—ইহজগতে এবং পরজগতেও।

ড. সতীশচন্দ্র *মহজর* পর্যালোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, এই ঘোষণাপত্র ভারতে নতুন ছিল না। সুলতানী রাজত্বে গিয়াসুদ্দীন বলবন এবং আলাউদ্দীন খলজী সাম্রাজ্য শাসন করার জন্য যে বিধি প্রয়োজন তাকেই জারি করেছিলেন এবং সে কাজ করার জন্য কোনও সময়ে *শরিয়ত*-কে আমল দেননি। *শরিয়ত* নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ছিল না বললেই চলে। *ইবাদাৎখানা*-য় আলোচনাকালে *উলেমা*-কে আকবর মূলত এক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে বিভক্ত দেখেছিলেন। *ইবাদাৎখানা* বন্ধ করার পেছনে এটাই ছিল প্রধান কারণ।

শরিয়ত-এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ যে মানুষে মানুষে ব্যাপকভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে আকবর তা প্রত্যক্ষ বুঝেছিলেন। একবার মথুরাতে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য মালমশলা জমা করা হচ্ছিল। এক ব্রাহ্মণ সেগুলি নিয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করে। তাকে বাধা দিতে গেলে সে নানারকম কটূক্তি করেছিল যার মধ্যে হজরত মহম্মদকেও সে গালি দিতে বাকি রাখেনি। কাজীর কাছে তার বিচার হয় এবং অবশেষে প্রধান সদর শেখ আব্দুন নবীর কাছে বিচারের জন্য ব্রাহ্মণকে পাঠানো হয়। এইসব সংবাদ রাজধানীতে প্রচারিত হওয়ায় তা প্রাসাদের হারেমেও পৌঁছে যায়। *উলেমা* দাবি করতে থাকে যে ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কিন্তু সম্রাটের হিন্দু-পত্নীরা ব্রাহ্মণের মুক্তি প্রার্থনা করেন। আকবর বিচারের ভার আব্দুন নবীকে দেন। আব্দুন নবী ব্রাহ্মণের মৃত্যুদণ্ড দেন ও তা কার্যকরী হয়। এই ঘটনা *উলেমা*-র সঙ্গে আকবরের বিরোধ গভীর করে তোলে। দণ্ড কার্যকর হওয়ার পর আকবর তাঁর ঘনিষ্ঠদের বলেন যে আব্দুন নবী নিজে *হানাফী* মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও এই কাজ করেছেন। কারণ, *খলিফা* আবু হানিফা নিজেই বলেছিলেন যে, কোনও *জিম্মী* (দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বা বিধর্মী) যদি জ্ঞাতসারে ইসলাম তথা হজরতের অবমাননা করে তাহলেও শাসক তার প্রাণরক্ষা করবে। এক্ষেত্রে আবু হানিফার নির্দেশ আব্দুন নবী অতি উৎসাহের বশে মানেননি। দ্বিতীয়ত, মুঘল রাজত্বে প্রাণদণ্ড একমাত্র সম্রাটই দিতে পারতেন, অন্য কেউ নয়। এটাও আব্দুন নবী মানেননি। অর্থাৎ সাম্রাজ্য শাসন করতে গেলে সম্রাটের কর্তব্য কী—এ বিষয়ে স্থির মত থাকা জরুরি এবং সেই মত সম্রাটই তৈরি করবেন— এমনই এক ধারণা শেখ মুবারক আকবরকে দেন। ১৫৭৮-এর ডিসেম্বর মাসে শেখ আব্দুন নবী এবং *মখদুম-উল-মুলক*কে বরখাস্ত করা হয়।

১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে জারি করা *মহজর* অনুসারে সম্রাটের সর্বজনীনতা স্বীকার করা চলে না কারণ, ঘোষণাপত্র অনুসারে সম্রাটের উপাধি হল *আমীর অল-মুমনীন* এবং *বাদশাহ-ই-ইসলাম* অর্থাৎ ইসলামের প্রধান শাসক। পরবর্তীকালে অবশ্য সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আকবরের মনোভাবে বদল এসেছিল। আবুল ফজলের রচনায় *মহজর* সংক্রান্ত অনেক তথ্যই গ্রাহ্য হয় না কারণ, তিনি আকবরকে অতিমানবের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। অনুমান হয়, তিনি এসব ইচ্ছাকৃতভাবেই লিখেছিলেন। ইক্তিদার আলম খান মনে করেন যে *বাদশাহ-ই-ইসলাম* রূপে আকবরকে অধিক দিন চালানো যায়নি যদিও তিনি প্রতি বছর, কোনও কোনও বছর একাধিকবার

আজমিড়ে চিস্তি দরগায় গিয়েছেন। ফতেপুর সিক্রিতে শেখ সেলিম চিস্তির দরগাতে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন এবং *মহাদেবিয়া* গোষ্ঠীর (যারা মৌলবাদের বিরোধী ছিল) প্রতি কঠোর আচরণ করেছেন অর্থাৎ তাঁর আচরণ পরিচ্ছন্ন ছিল না।

সম্ভবত রাজপুতদের আস্থা লাভের লক্ষ্যে অবশেষে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় দফায় *জিজিয়া* প্রত্যাহার করা হয়।

মহজর ঘোষণাপত্র কোনও আকস্মিক ব্যাপার বা আবেগতাড়িত ঘটনা ছিল না। ড. সতীশচন্দ্র বলেন যে দীর্ঘকালীন আলোচনার ফসল ছিল *মহজর*, তবে উপস্থিত *উলেমা* যে নিজেদের ইচ্ছায় ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন, তা নয়। বদায়ুনী, যিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী রেখে গেছেন, তাঁর মতে আব্দুন নবী ও আব্দুল্লা সুলতানপুরীর মতো কেউ কেউ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বাক্ষর করেছিলেন। এই ঘোষণাপত্র অনুসারে অবশ্য আকবরকে কোনোভাবেই *মুজতাহিদ* হিসাবে স্বীকার করা হয়নি, যদিও আবুল ফজল তাঁর *আকবরনামা*-য় তাই লিখেছেন। কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করার পর একজন শাসকের যা স্বাভাবিক কর্তব্য তারই ভিত্তিতে আকবর নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারটুকুই *মহজর* মারফত লাভ করেছিলেন। ওই কাজ করার জন্য বিভিন্ন মতাবলম্বী *মুজতাহিদ*-রা যে যে মত প্রকাশ করতেন সম্রাট হিসাবে নিজের পছন্দমতো মতটিকে তিনি গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ সম্রাট হিসাবে আকবরের সিদ্ধান্ত সকলই ছিল সাধারণের প্রয়োজনে এবং প্রশাসনেরও প্রয়োজনে। অবশ্য আধুনিককালের কিছু ঐতিহাসিক, মূলত যাঁরা পাকিস্তানের তাঁরা এমনও বলেন যে, *মহজর*-এর আড়ালে আকবর কার্যত স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছিলেন। তবে *মহজর*-এর মাধ্যমে আকবর যে মধ্যযুগের ভারতে সর্বপ্রথম সাধারণ শান্তি (*সুল-ই-কুল*) স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নেই। ঐতিহাসিক এস. এ. এ. রিজভির মতে, আকবরের দৃঢ় পদক্ষেপের কারণেই মৌলবাদী *উলেমা*-র সঙ্গে তাঁর চিরকালীন বিচ্ছেদ সূচিত হল। পাশাপাশি মুসলিম দুনিয়ায় আকবর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেন *মহজর* জারির মাধ্যমে। কারণ অটোম্যান সাম্রাজ্য ও পারস্যে সেই ধরনের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও শান্তি তখন ছিল না, যে ধরনের শান্তি ভারতের মতো বিধর্মীর দেশে আকবর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। *মহজর* ঘোষণার মধ্যেই আছে যে, তখন ভারতে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত। এই ন্যায়ের শাসনই যে ছিল আকবরের প্রাথমিক লক্ষ্য, তা আমরা জানি এবং সে কারণেই *উলেমা*-র সঙ্গে তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ে সংঘাতের পথে গিয়েছিলেন।

মৌলবাদীদের সঙ্গে সংঘাত

মহজর জারির মাধ্যমে যে আকবর *উলেমা*-কে বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন বা একপক্ষকে নিজের দিকে আনতে চেয়েছিলেন, তা ঠিক নয়। কারণ *উলেমা* সম্প্রদায় ছিল বিভক্ত। নানা কারণে মৌলবাদীদের সঙ্গে মতৈক্য হত না এবং *ইবাদাৎখানা* বন্ধ করার জন্য এই তিক্ত মতভেদই ছিল প্রধান কারণ। এভাবে *উলেমা* নিজেরাই বিভক্ত

হয়ে যাওয়ায় আকবরের পক্ষে সুবিধা ছিল নানারূপ। প্রথমত, মৌলবিদের মধ্যে ব্যক্তিগত অহমিকা ও তজ্জনিত কারণে অপরকে সহ্য করতে না পারা এবং দ্বিতীয়ত, বিদ্যাচর্চা ছাড়া ঐহিক নানা কাজে অতি মাত্রায় উৎসাহ আকবরকে তাঁদের সম্পর্কে হতাশ করেছিল। এমন অভিযোগ ছিল যে, প্রধান সদর আব্দুন নবী বিপুল পরিমাণে উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে *মদাদ-ই-মাস* (নিষ্কর জমি) দান করার ব্যবস্থা করতেন। আবার *জাকাত* প্রদান করা থেকে বিরত থাকার জন্য বছরের এক নির্দিষ্ট সময়ে আব্দুল্লা সুলতানপুরী তাঁর বিপুল সম্পত্তি স্ত্রীর নামে হস্তান্তরিত করতেন এবং কাজ শেষ হলে পুনরায় নিজের নামে করিয়ে নিতেন। সুলতানপুরী যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন, তা ভাবার কোনও কারণ নেই। এমন কাজই অন্যরাও করত। *মহজর* জারির পর আকবর আব্দুন নবী ও আব্দুল্লাহ সুলতানপুরীর নেতৃত্বে হজ তীর্থযাত্রীদের আরবে পাঠান এবং ভারতে তাঁদের ফিরতে নিষেধ করেন। ইতিমধ্যে আকবর নিজেই *খলিফা* হয়ে উঠেছেন বলে সাম্রাজ্য জুড়ে নানা আলোচনা শুরু হয়ে যায়, যার প্রভাব জনমানসে সর্বত্র খুব ভালো ছিল না। ইতিমধ্যে ১৫৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে *মনসবদার*-দের বেতন কাঠামোর স্থায়ী রূপায়ণ শুরু হয়েছে। তাদের অশ্ব এবং অশ্বারোহী সরকারের কাছে পেশ করতে হচ্ছে। এসবের ফলে সমর বিভাগে দুর্নীতি রোধের চেষ্টা আকবর করছিলেন। কিন্তু অভিজাতদের একাংশ এসব ব্যবস্থা মোটেই মানতে চাইছিল না। মূলত বাংলা ও বিহারের মতো দূরবর্তী অঞ্চলে তারা বিদ্রোহ করে এবং মির্জা হাকিমকে সম্রাট হিসাবে প্রচার করে। জৌনপুরের কাজী মুল্লা মুহম্মদ ইয়েজদি আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধর্মসঙ্গত বলে *ফতোয়া* জারি করায় উলেমা-র এক বড়ো অংশ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত হল। তাঁরই মতো বাংলার কাজীও *ফতোয়া* জারি করল। কিন্তু আকবর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করেন এবং জৌনপুর ও বাংলার কাজীদের আগ্রায় আহ্বান করেন। যমুনা নদী অতিক্রম করার সময়ে তাঁদের জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। আকবরের এই কঠোর ব্যবস্থাবলী যে প্রশাসনের প্রয়োজনেই ছিল একথা আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। ইসলামের প্রতি আকবরের কোনও রূপ বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু প্রশাসনে *উলেমা*-র অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি।

তৃতীয় পর্ব (১৫৮১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়কাল)

দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ রাজত্বকালে আকবর তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে রাষ্ট্রশাসনে প্রভাব ফেলতে দেননি যদিও *মহজর-এর* ঘোষণার মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান অনেকটাই মজবুত করেছিলেন। তবে ব্যক্তিগত জীবনে আকবরের ধর্মচিন্তায় বিখ্যাত দার্শনিক ইবন-ই-আরাবীর প্রভাব ছিল গভীর। তেমনি গভীর ছিল জালালুদ্দীন রুমীর প্রভাব। আকবর যেমন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি সেই বিশ্বাসকে কাজে লাগানোর জন্যও যত্নবান ছিলেন। একেই বলা হল *তৌহিদ-ই-ইলাহী*। এ বিষয়ে তিনি সুফিদের মতই বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ থাকলে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। এর জন্য চাই ব্যক্তিগত সাধনা। কোরান বা হাদিসকে অন্ধের মতো অনুকরণ (*তকলিদ*) করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চাইতেন যুক্তির দ্বারা (*তহকিক*) ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করতে।

তিনি যেমন গভীরভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন তেমনি তিনি আলোকে (*নূর*) মানে করতেন মানুষের ধর্মীয় চেতনা স্ফূরণের অন্যতম হাতিয়ার। এই আলোকে তিনি দেখেছেন সূর্য ও অগ্নির মাধ্যমে। আকবরের ধর্মবিশ্বাস তৈরির পেছনে একইসঙ্গে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান ও জরথুস্টবাদীদের ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। বদায়ুনী এ প্রসঙ্গে আকবরের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আকবর বীরবলের সান্নিধ্যে আসার পর থেকে সূর্যের সহস্র নাম প্রতিদিন জপ করতে শুরু করেন। হারেমে হিন্দু-পত্নীদের নিয়ে তিনি যজ্ঞ (*হবন*) করতেন এবং সূর্যের প্রতীকস্বরূপ একটি প্রদীপ অনবরত হারেমে জ্বালিয়ে রাখার জন্য তিনি বীরবলকে নির্দেশ দেন। মহাবিশ্বে যেমন সূর্য সমস্ত শক্তি ও আলোর উৎস তেমনি সাম্রাজ্যে তিনি নিজে সমস্ত ক্ষমতার উৎস—এমন বোধই আকবরের মধ্যে কাজ করত বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। আকবর জৈনদের তিথি ইত্যাদিকে সম্মান জানানোর জন্য সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেন এবং উন্মুক্ত স্থানে কাটা পশুর মাংস বিক্রিও বন্ধ করেন। হিন্দুদের উৎসব রাখীবন্ধন এবং হোলিতে তিনি অংশ নিতেন। সর্বোপরি হিন্দুদের জন্মান্তরবাদের ধারণার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। তবে হিন্দুদের বিশ্বাসমতো মৃতের আত্মার অন্যদেহে প্রবেশের তত্ত্ব তিনি স্বীকার করতেন না। আলোকে উপাসনা করার মন্ত্র আকবর যে কেবলমাত্র হিন্দুদের বা জরথুস্টবাদীদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন তা নয়। একাদশ শতকের দার্শনিক সুফি অল গজালী এবং *ইশরাফী* ও *নুকতাইস* সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও তাঁকে ওই ধারণায় প্রভাবিত করেছিলেন। সাম্রাজ্য শাসন করতে গেলে যে সকল ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন জরুরি—এটা আকবর এভাবেই অনুভব করেন। হিন্দুদের বিজয়া দশমীর পর্ব দশেরাতে যোগ দেন। প্রাচীন মধ্য এশীয় ঐতিহ্য অনুকরণ করে পারসিকদের নওরোজ অনুষ্ঠান সংগঠিত করেন। আবুল ফজল লিখেছেন যে, আকবর প্রতিটি মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যারা সত্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ধর্মাচরণ করত তাদের কাজে কোনও রূপ বাধা না দেওয়ারও সিদ্ধান্ত করেন।

বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় করার সময়ে আকবর নিশ্চিত হয়েছিলেন যে প্রতিটি ধর্মেই এক নিজস্ব সারসত্য আছে। কিন্তু ধর্মাচরণের অন্ধ গোঁড়ামির (*তকলিদ*) ফলে সেই সত্য মানবজীবন থেকে হারিয়ে যায়। মানুষ তখন ধর্মের সার অনুসন্ধান ত্যাগ করে তার বাহ্যিক জাঁকজমক এবং ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আকবরের এই উদারতাকে মৌলবাদী *উলেমা* নেহাতই বিধর্মী কাজ (*বিদৎ*) বলে গণ্য করেছিল। বদায়ুনী এমন মন্তব্যও করেছেন যে, আকবর হজরতকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন ও *শরিয়ত* অবজ্ঞা করেছেন। এর ফলে আকবর আদৌ ইসলামে বিশ্বাসী কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে থাকে। কেবলমাত্র মৌলবাদীরাই যে আকবরের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে সন্দিহান ছিলেন, তা নয়। খ্রিস্টান পাদ্রী মনসেরাট পর্যন্ত লিখেছেন যে, আকবরের ধর্মবিশ্বাস ঠিক কী ছিল, তা বলা কঠিন। তবে তিনি অবশ্যই মুসলমান ছিলেন না। মনসেরাট প্রমুখ জেসুইট পাদ্রীরা এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ওই ধরনের মন্তব্য করতেন। তাঁরা আকবরের দরবারে এসেছিলেন একটাই লক্ষ্য নিয়ে তা হল তাঁকে

খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। *ইবাদাৎখানা*-র আলোচনাসভাতে তারা যোগ দিয়েছিলেন কেবলমাত্র ইসলামকে বিদ্রূপ করার জন্য।

উলেমার প্রতি মনোভাব

উদার মনোভাব প্রদর্শন এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে বিচ্যুত করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আকবরের সঙ্গে *উলেমা*-র সম্পর্ক ভালো ছিল না। উপরন্তু *মহজর* জারির কারণে তিক্ততা গভীরতর হল। কিন্তু ড. সতীশচন্দ্র মনে করেন না যে *মহজর* ঘোষণাপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল *উলেমা*-র মধ্যে বিরোধ প্রকট করা। তাঁর মতে, ইতিমধ্যেই আব্দুল্লাহ সুলতানপুরী এবং শেখ আব্দুন নবীকে কেন্দ্র করে *উলেমা* মোটা দাগে বিভক্ত হয়েই ছিল। *ইবাদাৎখানায়* আলোচনাপর্বে *উলেমা*-র মানসিকতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং স্বল্প জ্ঞানের পরিচয় আকবর পেয়েছিলেন এবং তাদের আচরণে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন। আকবর নানাভাবে *উলেমা*-কে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু *উলেমা* সংশোধিত হয়নি বা সম্রাটের প্রতি তার পূর্বের মনোভাবের কোনও পরিবর্তনও ঘটায়নি। বরং ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে বিহার ও বাংলায় অভিজাতদের যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তার পিছনে উলেমার প্রত্যক্ষ মদত ছিল। জৌনপুর এবং বাংলার দুই *কাজী* আকবরের বিরুদ্ধে *ফতোয়া* জারি করে ওই বিদ্রোহকে ঈশ্বর নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা হাকিমকে এই সুযোগে সম্রাট রূপে ঘোষণাও করা হয়েছিল।

কিন্তু সমকালীন ব্যবস্থা থেকে আকবর বিচ্যুত হতে পারেননি। *উলেমা* বা ধর্মীয় ব্যক্তিরা ইসলামের ব্যবস্থা অনুযায়ী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত হত। মুঘল শাসনেও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখা হয়। মুঘল ভারতে ওই ধরনের ব্যক্তিদের ভরণপোষণের জন্য নিষ্করভূমি দানের এক প্রথা বিদ্যমান ছিল। এদেরই বলা হত *মিলক, সয়ূরঘল* বা *মদাদ-ই-মাস*। ইসলামের ব্যবস্থা মেনে আকবর এই জাতীয় ভূমি বণ্টনের ক্ষমতা রাজধানীর প্রধান *সদর* ও প্রাদেশিক *সদর*-দের হাতে দিয়েছিলেন। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে ওই পদে শেখ আব্দুন নবীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। আব্দুন নবী ব্যাপক হারে লোদী ও শের শাহের রাজত্বকালে আফগানদের যেসব *মদাদ-ই-মাস* ভূমিদান করা হয়েছিল সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে নেন। এর ফলে *খালিস* জমির পরিমাণে ও রাজস্বের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটেছিল। এইসব কাজের সময়ে আকবর কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতেন না বলেই মনে হয়। বদায়ুনী লিখেছেন যে, পূর্বে কোনও সময়ে *সদর* এত ক্ষমতা ভোগ করেননি যা আব্দুন নবী তখন করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। আকবর তখন স্বয়ং ৫০০ বিঘার অধিক ভূমি যারা লাভ করেছিল তাদের সেই পরিমাণে ছাঁটাই করতে শুরু করেন। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল বিপুল পরিমাণে *মদাদ-ই-মাস* ভূমিলাভের কারণে *উলেমা* অলস হয়ে উঠেছে ও উৎপাদনমুখী কোনও কাজই করে না। এই পথেই ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে এক নির্দেশে বলা হল যে, নিষ্কর ভূখণ্ডের অর্ধেক হবে কৃষিযোগ্য ভূমিতে এবং অবশিষ্টাংশ কর্ষিত ভূমিতে। কিন্তু সমগ্র *মদাদ-ই-মাস* জমি যদি কর্ষিত এলাকাতেই নির্দিষ্ট হত সেক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ অংশ *খালিস*-এ রূপান্তরিত করা হত। এভাবে *উলেমা*-কে কৃষির উন্নয়নে পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল যে *মদাদ-ই-মাস* ভূমি কি শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই বণ্টিত হত? ভারতে হিন্দুসমাজে *দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর* প্রভৃতি শিরোনামে নিষ্কর ভূমি বণ্টিত হত। মধ্যযুগে বহু ক্ষেত্রে হিন্দু রাজন্যবর্গ ও সামন্তরা ওই দান নিয়মিত করতেন। কিন্তু আকবর হিন্দুদেরও *মদাদ-ই-মাস* ভূমি বণ্টনের পদ্ধতি চালু করেন। সাম্প্রতিককালে ড. ইরফান হাবিব এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে বৃন্দাবনে কিছু মন্দিরে আকবর ওই ধরনের ভূমিদান করেছিলেন। বদায়ুনীর রচনাতেও এর সমর্থন আছে। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে হিন্দু, জৈন ও পারসীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে *মদাদ-ই-মাস* ভূমির বণ্টন হতে থাকে। পাশাপাশি আকবর অনাথ ও ভবঘুরেদের জন্য নিত্যভোজনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। ফতেপুর সিক্রির বহির্দেশে হিন্দুদের জন্য *ধরমপুরা,* মুসলমানদের জন্য *খয়েরপুরা* এবং হিন্দু যোগীদের জন্য *যোগীপুরা* নামে তিনটি পৃথক দাতব্য ভোজনালয় খুলেছিলেন।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আকবর গোঁড়া *উলেমা*-র যাবতীয় প্রভাব রদ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইসলামী ব্যবস্থা অনুসারে *উলেমা* যে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত সে সবই তিনি হ্রাস করেন এবং প্রশাসনকে যথেষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলেন।

দীন-ই-ইলাহী

জেসুইট পাদ্রীরা সর্বদা একথা বলতেন যে আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তাঁদের বক্তব্যকে অনেকটাই সমর্থন জানিয়েছেন বদায়ুনী। আকবর এক নতুন ধর্মমত চালু করেন বলেও বদায়ুনী লিখেছেন। হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এমনকি জরথুস্টবাদীদের ধর্মের সার নিয়ে আকবর *দীন-ই-ইলাহী* নামে এক নতুন ধর্মমতের প্রচলন ঘটান এবং নিজেকে ওই ধর্মের প্রধান গুরুর পদে অধিষ্ঠিত করেন। পাদ্রী মনসেরাট মনে করেছিলেন যে, আকবর নিজেকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করতে চাইছিলেন এবং তাঁর এমন বিশ্বাসও ছিল যে অলৌকিক সব ক্রিয়াকাণ্ড তিনি সম্পাদন করতে পারেন। দীর্ঘকালযাবৎ এই জাতীয় ধারণা প্রচলিত ছিল যে আকবর নতুন এক ধর্মমত চালু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই তথ্য স্বীকার করেন না। তাঁদের যুক্তি যে *দীন-ই-ইলাহীর* কোনও ধর্মগ্রন্থ ছিল না, কোনও আচার-অনুষ্ঠান ছিল না, এমনকি, কোনও পুরোহিত বা যাজকও ছিল না। অবশ্য সমকালীন কিছু তথ্য এমন আছে যে, ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে আকবর দরবারে ঘোষণা করেন যে তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্ম গ্রহণের জন্য একজন মাননীয় শেখকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র পাঠানো হবে। কিন্তু এই তথ্য সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

দীন-ই-ইলাহী ও তার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কের সীমা নেই। সর্বপ্রথম এই প্রসঙ্গে লেখেন মহসীন ফনি তাঁর *দাবিস্তান-ই-মজহিব* নামক গ্রন্থে, যা শাহজাহানের রাজত্বের শেষপর্বে লেখা হয়েছিল। আবুল ফজল কোনও সময়ে *দীন-ই-ইলাহীর* উল্লেখ করেননি যদিও তিনি *তৌহিদ-ই-ইলাহী* বা স্বর্গীয় একেশ্বরবাদের কথা বলেছেন। কিন্তু বদায়ুনীর রচনাতে দুটিরই উল্লেখ পাওয়া যায়। আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরী*-তে লিখেছেন যে পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষ *দীনের* (ধর্মের) প্রতি আগ্রহী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর *দুনিয়ার* (পার্থিব জগৎ) প্রতি আগ্রহী। উভয়ের সম্মিলনের মাধ্যমেই ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভব। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আবুল ফজল গোঁড়ামি ও ধর্মীয়

হানাহানিকে সমর্থন করেননি। মানুষের মনে সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কে নানারূপ ধারণার জন্ম হয় ও তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে। এমন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের সম্রাটের শরণ নেওয়া কর্তব্য। এখানে আবুল ফজল আকবরের কিছু ঈশ্বরিক শক্তি ও মহিমার কীর্তন করে লিখেছেন যে, সম্রাটের জন্মই হয়েছিল এই দায়িত্ব পালনের জন্য। আবুল ফজলের বক্তব্য অনুসারে আকবর এমন কথা নাকি বলতেন যে, একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বর সাধনার পথপ্রদর্শনের জন্য অবশ্যই একজন গুরুর শরণে যেতে হয়। অতএব গুরুর কর্তব্য হল শিষ্যকে ঈশ্বর অনুভূতি প্রদান করা, নিজের সেবকে পরিণত করা নয়।

দীন-ই-ইলাহী-র ব্যবস্থা অনুসারে গুরু-শিষ্য পরম্পরা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এ বিষয়ে আকবর সুফি-সাধকদের পথ অবলম্বন করেছিলেন। এই মতবাদে বিশ্বাসী হলে এক ব্যক্তিকে তার গুরুর প্রতি চারটি স্তরে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে হত। বদায়ুনীর রচনা অনুসরণ করে বলা যায় যে সম্রাটের কাছে চারটি স্তরে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য যেভাবে নিবেদন করতে হত তা ছিল এইরকম—*জান*(জীবন), *মাল*(সম্পদ), *দীন*(ধর্ম) এবং *ইমান*(সম্মান)—এগুলির সবকটি যে শিষ্য (*মুরীদ*) তার গুরুর কাছে সমর্পণ করত সে-ই ছিল শ্রেষ্ঠ শিষ্য। কেউ দুটি বা একটি নিবেদনও করতে পারত। বলাই বাহুল্য যে, সে শ্রেষ্ঠ *মুরীদ* হতে পারত না।

আধুনিক ইতিহাসকাররা এই জাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু দেখতে পাননি। মধ্যযুগের সুফি-সাধকরা এই প্রক্রিয়াতেই গুরু-শিষ্য *(মুরীদ-মুরশিদ)* পরম্পরা বজায় রেখেছিলেন। আকবর *দীন* দাবি করেছিলেন। এক্ষেত্রে *দীন* বলতে তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসকে বোঝানো হয়েছে। এই বিশ্বাস মানুষকে কেবলমাত্র অনুকরণ (*তকলিদ*) করতে শেখায়, যুক্তি দিয়ে (*তহকিক*) বিচার করতে আদৌ শেখায় না। এর ফলেই মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও ধর্মে ধর্মে ঠোকাঠুকি ঘটে। আকবর গোঁড়া ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তার মধ্য দিয়েই তিনি *সুল-ই-কুল* প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ড. এস. আর. শর্মা মন্তব্য করেছেন যে, নতুন কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আকবরের ছিল না। এ প্রসঙ্গে ড. আতাহর আলীর মন্তব্য হল, আকবরের লক্ষ্য ছিল এক পথপ্রদর্শকের কাজ করা। তিনি আকবরের 'ঝরোকা দর্শন' ব্যবস্থাকেও একই দৃষ্টিতে দেখতে চান। কোনও হিন্দুশাসক এই প্রথা অনুসরণ করেননি। কিন্তু আকবর করেছিলেন নিজেকে 'গুরু'র পদে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। ড. আতাহর আলী প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জীবনের শেষ ২৫ বছরে আকবর যে শুধুমাত্র সমস্ত ধর্মের প্রতিই সহনশীল মনোভাব দেখিয়েছেন, তা নয়। তিনি শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে বিদ্বেষ রোধে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আবুল ফজল এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, আকবর ঘোষণা করেন যে প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজের নিজের পছন্দমতো উপায়ে উপাসনা করবে। অর্থাৎ নিজে সুন্নিমতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আকবরের একমাত্র লক্ষ্য তখন কীভাবে সাম্রাজ্যে সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলা যায়।

কিন্তু আকবর তাঁর শিষ্যদের (*মুরীদ*) চয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। ব্লখম্যানের কৃত *আইন-ই-আকবরী-র* অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, চারটি স্তরের সর্বোচ্চ মানের যাঁরা আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮। এঁদের মধ্যে একমাত্র হিন্দু ছিলেন রাজা বীরবল। রাজা মান সিংহ এই জাতীয় কোনও অনুশাসন মানতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের এক অনুষ্ঠানে আকবর মান সিংহকে *মুরীদ* হতে আহ্বান জানালে মান

সিংহ বলেন যে *মুরীদ* হওয়ার মাধ্যমে যদি নিজের সব কিছু বাদশাহের কাছে সমর্পণ করতে হয় তাহলে ইতিমধ্যেই তিনি তা করেছেন। সম্ভবত এই উত্তরের পর আকবর এ প্রসঙ্গে আর অগ্রসর হননি। কিন্তু প্রশ্ন হল আকবর যে অর্থে *মুরীদ*-দের দেখতে চেয়েছিলেন সাধারণভাবে জনমানসে সেই অর্থ প্রচারিত হয়নি। কারণ মান সিংহের যুক্তি ছিল যে, তিনি হিন্দু এবং বাদশাহ চাইলে মুসলমান হতে প্রস্তুত। অর্থাৎ আকবর *দীন-ই-ইলাহী*-র মাধ্যমে একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করতে চলেছেন। কিন্তু আকবর নিজে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর কাছে ধর্ম তখন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি। তিনি আনুগত্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন ধর্মগুরু হিসাবে নয়—রাজনৈতিক প্রধান হিসাবে।

মনে রাখতে হবে যে, ইতিমধ্যে আকবর তাঁর *মনসব* ব্যবস্থাও চালু করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি অভিজাতশ্রেণীকে পুরোপুরি নিজের অনুগত রাখতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক আনুগত্যকে তিনি ব্যক্তিগত রূপ দিতে সচেষ্ট। ফলত যাঁরা তাঁর *মুরীদ* হতেন তাঁদের তিনি নিজস্ব প্রতিকৃতি (*শস্ত* বা *সবি*) উপহার দিতেন। সেই প্রতিকৃতি অভিজাত *মুরীদ* নিজের উষ্ণীষে ধারণ করতেন এবং দেবজ্ঞানে তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। সম্ভবত এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক রিজভী এমন মন্তব্য করেছেন যে, আকবর *দীন-ই-ইলাহী* প্রবর্তনের মাধ্যমে মুঘল রাষ্ট্রশক্তিকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ড. ইক্তিদার আলম খান দেখিয়েছেন যে, ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যেসব অভিজাত মুঘল চাকরি গ্রহণ করে তাদের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানরাও ছিল। তাদের সংখ্যাই ছিল ক্রমবর্ধমান। ১৫৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে ভারতীয় মুসলমান ও রাজপুতরাই সম্রাটের পিছনে ঐক্যবদ্ধভাবে ছিল—অন্যান্য গোষ্ঠী সেভাবে নয়। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে আকবর যে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিলেন এইসব ঘটনা তারই প্রমাণ।

পাশাপাশি ১৫৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে আকবর ইসলামী বিধিব্যবস্থা থেকে শাসন ব্যবস্থাকে বহুলাংশে মুক্ত করতে সমর্থ হন। কারণ, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ওপর শাসন নিরঙ্কুশ করতে তিনি যথেষ্ট সাহসী পদক্ষেপ নেন।

আইন-ই-আকবরী-তে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তিগত জীবনে আকবর যাবতীয় আচার-সর্বস্ব ধর্মীয় বিধিনিয়মকে অস্বীকার করে ঈশ্বর ভজনাকে অন্যভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর উপাসনা হল *রৌশন-দিল-এ নূর দোস্তি* (ভালোবাসার আলোয় হৃদয়কে আলোকিত করা)। অতএব হিন্দু কী মুসলমান কী খ্রিস্টান—যে-কোনও ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আকবরের কাছে একই অর্থ বহন করত। কিন্তু আকবর ইসলামের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি নিয়মিত হজযাত্রীদের অর্থসাহায্য করেছেন, মাদ্রাসা, খানাকাহ নির্মাণ করিয়েছেন এবং অগণিত মসজিদের ব্যয়ভার বহন করেছেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করার স্বার্থে আকবর এই *দীন*-কে হাতিয়ার করেছিলেন মাত্র।

অতএব আকবর ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন—এ দাবি করা যায় না। গো-হত্যা একমাত্র নিষিদ্ধ হয় পাঞ্জাবে, যা জাহাঙ্গীরও বজায় রাখেন।

সহায়ক গ্রন্থসূচী :-

১. হাবিব, ইরফান (সম্পাদিত) - সুলহ-ই-কুল এবং আকবরের ধর্মীয় চেতনা' কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, এপ্রিল-2000

২. শ্রীমতী সৌমিত্র - 'মুঘলযুগ থেকে কোম্পানী আমল" নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ~~জানুয়ারী 2008~~ জানুয়ারী - 2008

৩. রায়, অনিরুদ্ধ - মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, অক্টোবর - 2005

৪. চৌধুরী প্রেমলতা - ভারতের ইতিহাস ১৫২৬-১৭০৭, জুলাই - ২০১৪

৫. Khan Iqtidar A. "The Nobility under Akbar and the Development of his Religious Policy, 1560 - 1580' Journal of Royal Asiatic society, 1968.

৬. Chandra Satish. "Mughal Religious Policies, the Rajputs and the Deccan"